ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ৫০ কিমি ক্ষমতাবৃদ্ধি :

একটি মূল্যায়ন

দেশভাগের ইতিকথা

ইংলন্ডের পার্লামেন্টে Indian Indepence Act ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই পাশ হল।স্বাধীনতা আন্দোলনের শত শত শহীদেররক্তকে ব্যর্থ করে, দেশটা দু টুকরো করে ক্ষমতার লোভের কাছে মাথা নত করা হল 'স্বাধীনতা' পাওয়ার জন্য। শ্যামাপ্রসাদ-দের হিন্দুরাষ্ট্রের দাবী ও আওয়ামী লীগের সমর্থনে কম্যুনিষ্টদেরপাকিস্তানগঠনে 'প্রস্তাব' আগু নেঘিপড়ল।দ্বিজাতিতত্ত্বেরভিত্তিতে রাতের অন্ধকারেভারতভাগহল।র্যা ডক্লিফ সাহেবের অবিবেচকের মত ছুরিকাঘাতে ১৯৪৭ সালে ভারতের মানচিত্র থেকে আলাদা হয়ে জন্ম হয় পাকিস্তানের। শুধু দেশভাগের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের হত্যা ও প্রায় ২ কোটি মানুষের দেশত্যাগের মধ্যে জুড়িগাড়ি চেপে এল ভারতের স্বাধীনতা। দেশভাগের ফলে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত ও রক্তাক্ত হল বাংলা ও পাঞ্জাব — এই দুই রাজ্য।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১, নানান টালমাটালের মধ্যে চলল পূর্ব পাকিস্তান। এরপর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের। '৪৭-এ ভারত জন্মের সময় থেকে পাকিস্তান শত্রু রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত; এখনও যা অপরিবর্তিত। ১৯৭১ থেকে ভারত – বাংলাদেশ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলেই চিহ্নিত। ১৯৬৫ সালে ভারত – পাকিস্তান যুদ্ধের পরে ১৯৬৮ সালের জন্ম নিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বি এস এফ)। বাংলাদেশের সাথে সখ্যতা থাকলেও, পাকিস্তান সীমান্তের মতোই, ভারত – বাংলাদেশ সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব দেওয়া হলো বি এস এফ কেই।

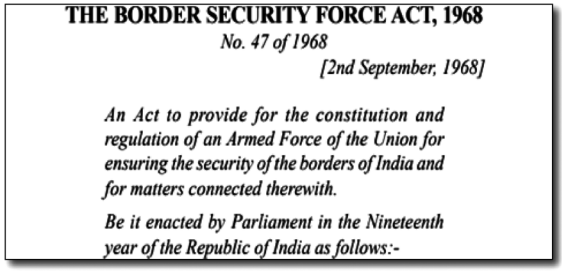

THE BORDER SECURITY FORCE ACT, 1968

No. 47 of 1968

[2nd September, 1968]

An Act to provide for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the borders of India and for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Nineteenth year of the Republic of India as follows:-

যেখানে প্রতিবেশী অন্য বন্ধু রাষ্ট্র যেমন নেপাল বা ভূটান সীমান্তের পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয় সশস্ত্র সীমা বল (এস এস বি) কে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে কেন এই পৃথকীকরণ, বৈষম্য? কোন উত্তর নেই।

ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত মোট ৪০৯৬ কিমি। এটি ভারতের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 'সর্ববৃহৎ 'সীমান্ত; এবং সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা হিংস্র, রক্তক্ষয়ী সীমান্তগুলির মধ্যে অন্যতম। ভারত বাংলাদেশের সীমান্তের সিংহভাগই (২২১৭কিমি) এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে গেছে।ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সুদীর্ঘ ৪০৯৬ কিলোমিটার লম্বা সীমান্ত বর্তমান। এর মধ্যে আসাম রাজ্যের মধ্যে ২৬২ কিলোমিটার, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৮৫৬ কিলোমিটার, মিজোরাম রাজ্যের মধ্যে ৩১৮ কিলোমিটার, মেঘালয় রাজ্যের মধ্যে ৪৪৩ কিলোমিটার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ২২১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত আছে। এই সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা অধিকাংশই প্রান্তিক

জনগোষ্ঠীর; মুসলিম ও তফশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ। পূর্বের ঘটনার মত কেবল মানুষ পাচারের ঘটনার ক্ষেত্রে নয় আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা সীমান্তবাসীদের বেঁচে থাকাকেই প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলি ভোগ করার ক্ষেত্রে, ভারতের যে কোন প্রান্তের শহর, মফঃস্বল বা গ্রামের কোন সাধারণ নাগরিকের সাথে, পশ্চিমবাংলা-বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। উত্তর চব্বিশ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, গাইঘাটা; মুর্শিদাবাদের রাণীনগর, লালগোলা; নদীয়ার বানপুর, করিমপুর বা ধানতলা; মালদার পঞ্চানন্দপুর, কালিয়াচক; দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট বা হিলি; উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ বা গোয়ালপোখর; জলপাইগুড়ি জেলার বেড়ুবাড়ি এবং কোচবিহারের দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি-হলদিবাড়ি অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে তারা ভারতে থেকেও এদেশের বিজাতীয় নাগরিক। ভারতের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি, প্রশাসনিক পরিকাঠামো, সরকারি কার্যকলাপ, জীবন-জীবিকা, পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য -সর্বক্ষেত্রেই এই অঞ্চলের মানুষগুলি এক নৈরাজ্যের বাসিন্দা। উত্তর ভারত থেকে নিয়ে আসা গরুর পাল প্রকাশ্য দিবালোকে পশ্চিমবাংলার সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে যায় আবার মাথাপিছু ৫০০ বা ১০০০ টাকার বিনিময়ে। নির্দিষ্ট ঘাট দিয়ে এপার থেকে ওপার বা ওপার থেকে এপারে আসা-যাওয়া করা যায় নির্বিবাদে। এপারের বিএসএফ ও ওপারের বিজিবি, দুটি বাহিনীই দুর্নীতিগ্রস্ত। সীমান্ত পেরোনোর জন্য আড়কাঠি দালালরা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। এদের রক্ষার জন্য আছে নিয়মিত নজরানা পাওয়া পুলিশ, বিএসএফ, কাস্টমস এবং রঙ বেরঙের রাজনৈতিক দলগুলির কিছু কর্মকর্তা। দশ বছরের বালক-বালিকা বুকে ঘাটি দিয়ে ভারতে ঢুকে সোজা দালাল মারফৎ পৌঁছে যায় দিল্লী বা পুনের লালবাতি এলাকায়, নারী মাংসের বাজার ফুলে ফেঁপে ওঠে।

মানব পাচার

মানুষ পাচারের ঘটনায় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সীমান্ত হলো মুক্তাঙ্গণ। প্রতি দিনই উক্ত জেলার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে মানুষ পাচারের ঘটনা রোজনামচার পর্যায়ে নেমে এসেছে। সেই পাচারে কোন বাংলাদেশী মানুষ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পরলে তাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের কাছে এবং সেই পুলিশ আধিকারিক তার মত 'তদন্ত' করে তাদের বিরুদ্ধে Foreigners Act-এর ১৪ নং ধারায় অভিযুক্ত করে কোর্টে চালান করছে এবং কোর্টের রায়ে তারা ভারতীয় সংশোধনাগারে দিনযাপন করে চলেছেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী (Memorandum No- 14051/14/2011-F.VI dated 1st May 2012) SAARC এর দেশগুলির মধ্যে যদি কোন মহিলা বা শিশু উপযুক্ত কাগজপত্র ছাড়া ধরা পরেন এবং তারা যদি পাচার হয়ে থাকেন তবে তাঁদের ফৌজদারী কেসে অভিযুক্ত না করে, কোন হোমে রেখে, তাঁদের যত শীঘ্র সম্ভব নিজ নিজ দেশে পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে

হবে (সংযোজনী - ১)। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তার কিছুই হয়না বরং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পাশবিক হিংস্রতা ধরা পরে এবং রাজ্য সরকারের পুলিশ ও বিচার বিভাগের সংবেদনশীলতার অভাব চোখে পরে। নিম্নে বর্ণিত ঘটনাই তা প্রমাণ করবে।

ঘটনা - ১

২৭শে জুলাই ২০২১, অর্থাৎ মাত্র ৬ মাস আগের ঘটনা। রাত্রি ১১.৩০ টা নাগাদ খড়েরমাঠ বর্ডার আউট পোস্টের ১৫৮ ব্যাটেলিয়নের কিছু সীমান্তরক্ষী দুই জন বাংলাদেশী মহিলাকে আটক করে। এর প্রায় আধ ঘন্টা পর সেই দুই মহিলাকে উক্ত আউট পোস্টে নিয়ে আনা হয়। যখন আউট পোস্টে তাকে নিয়ে আনা হয় তখন কোন মহিলা সীমান্তরক্ষী সেখানে উপস্থিত ছিলোনা। এরপর সাব ইন্সপেক্টর রামেশ্বর কয়াল ঐ বাংলাদেশী মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেন। জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁদের নামে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। এরপর রাত্রি ১.৩০ টা নাগাদ ঐ সাব ইন্সপেক্টর একজন বাংলাদেশী মহিলাকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ধর্ষণ করেন। এই ধর্ষণের কথা ঐ বাংলাদেশী মহিলারা কোম্পানি কমান্ডান্ট কে বলার চেষ্টা করলেও তিনি উলটে তাঁদেরকেই গালিগালাজ করেন। পরদিন অর্থাৎ ২৮ শে জুলাই ২০২১ এ বাংলাদেশী মহিলাদের গাইঘাটা থানায় চালান করলে সেই কেসের তদন্তকারী অফিসার সেই বাংলাদেশী মহিলাদের জবানবন্দী নেন এবং অভিযুক্ত সীমান্তরক্ষীর বিরুদ্ধে কেস দায়ের করেন।

এই হল নির্যাতনের নগ্ন রূপের একটি উদাহরণ। এইসকল ঘটনা "Breaking news" হয়না। এই ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছে আসার আগেই চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। তাই স্বভাবতই এই ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনা। অথচ প্রতিদিন এইরূপ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সীমান্তে ঘটে চলেছে নিরন্তর।

কাঁটাতার - জমি অধিগ্রহণ - এবং ...

সীমান্তবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত। কিন্তু একজন স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে নিজের জমিতে নিজে চাষ করে জীবন ধারণ করবে সেই সুযোগও রাখেনি সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এই জটিল সমস্যাটিকে বুঝতে গেলে আগে যেটিকে বুঝতে হবে, তা হল - কাঁটাতার এবং IBP (International Border Pillar) এর অবস্থানগত সমস্যার কথা। আমরা বেশীরভাগ মানুষই মনে করে থাকি সীমান্তে কাঁটাতারের ওপর পাশেই হল ভিন দেশ। কিন্তু বাস্তবে তা সত্যি নয়। এরকারণ এই কাঁটাতার বসানো হয়েছে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। কাঁটাতার বসানোর আগে জেলা প্রশাসন বা কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর কর্তারা সীমান্তবাসীদের সাথে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেননি। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কাঁটাতার রাখতে গেলে সেটিকে প্রকৃত সীমান্ত (IBP) থেকে ১৫০ গজের মধ্যে থাকতে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ - বাংলাদেশ সীমান্তে খুব কম জায়গা আছে যেখানে প্রকৃত সীমান্ত থেকে কাঁটাতারের দুরত্ব ১৫০ গজ। বেশীরভাগ জায়গাতেই গড়ে

এই দুরত্ব থাকে ৫০০ মিটার থেকে ১ কিলোমিটার অব্দি। কিছু কিছু জায়গায় এই দুরত্ব ৫ কিলোমিটার থেকে ১০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কাঁটাতারের অপর পারে ঐ বিস্তীর্ণ এলাকা ভারতীয় ভূখন্ডের মধ্যেই পরে এবং স্বভাবতই ঐ জমির মালিক কোন না কোন সীমান্তবাসী যিনি ভারতীয়। সেখানে একবারের জন্যেও ঐ এলাকার বসবাসকারী সীমান্তবাসীদের কথা ভাবা হয়নি, বরং কাঁটাতার বসানোর সময় সীমান্তবাসীদের বোঝানো হয় তাঁদের জমিতে যাওয়ার জন্য থাকবে গেটের ব্যবস্থা এবং তা দিনে ১২ ঘন্টা খোলা থাকবে। তাঁদের চাষের কোন সমস্যাই হবেনা। গরীব চাষীরা সেই কথাই বিশ্বাস করেন। দেশের স্বার্থে তাঁরা সম্মতি জানিয়েছিলেন। সেই সময় অনেক সীমান্তবাসীদের কাছ থেকে জমি পর্যন্ত নেওয়া হয় কাঁটাতার বসানোর জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সেই মানুষদের “Land Looser” বলে পরিগণিত করা হয় এবং তাঁদের জন্য প্রদত্ত জমির সমমুল্য ক্ষতিপূরণ দান এবং সরকারী ক্ষেত্রে চাকরী পাওয়ার জন্য বিশেষ সুবিধার কথা ঘোষণা করা হয়। [পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রমদপ্তর বিজ্ঞপ্তি নং 301-EMP/IM-10/2000, para 3, point number 3.(2)] (সংযোজনী - ২)। কিন্ত এর সার্বিক বাস্তবায়ন আজও হয়নি। আজও সীমান্তবাসীরা ক্ষতিপূরণের ন্যায্য টাকার জন্য, সরকারী চাকুরির জন্য হন্যে হয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ঘুরে যাচ্ছেন।

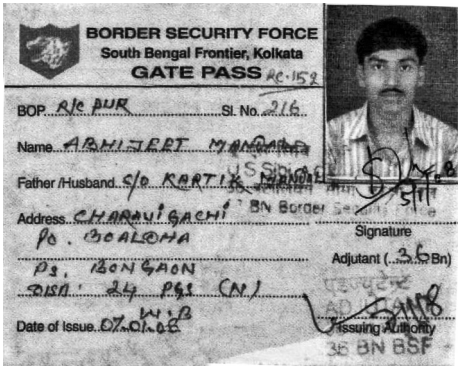

এর সাথে শুরু হলো সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের নিয়মের বেড়া জাল। ১২ ঘন্টার জায়গায় দিনে ৩ বার গেট খোলা হলো ১ ঘন্টা করে। সকাল ৭টা থেকে ৮ টা, দুপুর ১২ টা থেকে ১টা এবং বেলা ৩টা থেকে ৪ টা। এর মধ্যে নিজের জমিতে ঢুকতে হবে, চাষ করতে হবে এবং এরই মধ্যে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে আটকে থাকতে হবে ধূ ধূ প্রান্তরে, যেখানে রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার কোন ছাউনি নেই, বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। এরপর শুরু হল বিভিন্ন বিষয়ে বাধা। সরকার কর্তৃক দেয় নাগরিকত্বের পরিচয়পত্রের পাশাপাশি সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের কাছ থেকেও জোগাড় করতে হবে আরো এক পরিচয় পত্র; যা ইস্যু করবে বিএসএফ, সরকারি আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের ওপরে যার স্থান। সেটি আবার গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তার জন্য সপ্তাহ খানেক হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে ততদিন তারা নিজের জমিতে চাষ করতে যেতে পারবেন না । এরপর সেটি জোগাড় করলেও অন্য বিপত্তি শুরু হবে। চাষের জন্য সীমান্তবাসীরা নিজের জমিতে চাষ কর তাও স্থির করবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। একের বেশী দুটো গরু তে আপত্তি, ট্র্যাক্টর ব্যবহারে আপত্তি, পরিমান মত সার

BORDER SECURITY FORCE
South Bengal Frontier, Kolkata
GATE PASS

BOP R/C PUR SI. No. 216
Name ABHIJEET MANDAL
Father /Husband S/O KARTIK MANDAL
Address CHARAVIGACHI
PO. BOALOHA
PS. BONGAON
DIST. 24 PGS (N)
W.B
Date of Issue 07.01.08
Signature
Adjutant (36 Bn)
Issuing Authority
36 BN BSF

বা কীটনাশক নিয়ে যাওয়াতে আপত্তি, ৩ ফুটের উপর ফসল ফলানোয় আপত্তি ইত্যাদি। একই অবস্থা মৎস্যজীবীদের। এর পাশাপাশি অমানবিকতার নিদর্শন তো আছেই। সীমান্তবাসীরা নিজেদের মাঠে যাওয়ার সময় তারা নিজেদের দ্বিপ্রাহরিক আহার সঙ্গে করে নিয়ে গেলে তাও পরীক্ষা করবে সীমান্তরক্ষীরা। সেই খাবার তারা একটি লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরীক্ষা করবে, যেই লাঠি দিয়ে তারা গরুও তাড়ায় আবার নর্দমাও পরিস্কার করে।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা যে কেবলমাত্র চাষে বাধা দিচ্ছে তা নয়, বাধা দিচ্ছে সীমান্তবাসীদের জীবনযাত্রাতেও। কাঁটাতারের পাশ দিয়ে যে CPWD এর রাস্তা গেছে, যাকে IBBR (Indo-Bangladesh Border Road) বলে, তা সীমান্তবাসীদের সূর্যাস্তের পর ব্যবহার করতে দেওয়া হবেনা। নিত্যদিনের বাজারের সামগ্রী কত পরিমানে আনা হবে তা স্থির করে দেবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অনুমতি ব্যতীত আত্মীয় স্বজনেরা বাড়িতে আসতেও পারবেন না। বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে সেখানে কারা আসবেন এবং তাতে কী খাওয়ানো হবে তা স্থির করবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সীমান্তবাসীর মধ্যে অনেক মানুষই হলেন মুসলিম জনজাতি ভুক্ত। গরুর মাংস খাওয়ার চল সেখানে ঘরে ঘরে। কিন্তু বিজেপি - সরকার - পোষ্য কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী সেই গোমাংস খেতে বা বিক্রি করতে দেবেনা। গোমাংস বিক্রি করার সরকারী লাইসেন্স থাকলেও তাকে তোয়াক্কা করেনা সীমান্তরক্ষীরা।

ঘটনা - ২

শ্রীমতি রাহেলা বেওয়া মুর্শিদাবাদ জেলার চর পরাশপুর গ্রামের একজন বাসিন্দা। ২৯ বছর বয়সী রাহেলার স্বামী মিজানুর শেখ ৩ বছর আগে মারা যান। এক পুত্র এবং কন্যাকে নিয়ে তার সংসার। পদ্মার ভাঙ্গনে প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে কোনওমতে জীবনধারণ করছেন রাহিলা। সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী মিজানুরের মৃত্যুর পর অন্যের মাঠে ভূমি শ্রমিকের কাজ করে সামান্য রোজগারই তাঁদের বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল। অর্থকষ্টের কারণে তাঁর পুত্রের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

গত ২০শে জুলাই ২০২১, রাহিলা ঈদ উপলক্ষে তাঁর সন্তানদের জন্য কিছু নতুন জামাকাপড় এবং গো মাংস কেনার উপলক্ষে বাড়ি থেকে বার হন। যাওয়ার পথে ফরাজিপাড়া বি এস এফ ক্যাম্পে তাঁর পরিচয়পত্র জমা নেওয়া হয় এবং তাকে নিকটস্থ বাজারে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। দুপুর ২.৩০ টা নাগাদ রাহিলা জিনিসপত্র কিনে ফেরার পথে পুনরায় উক্ত বি এস এফ ক্যাম্পে যান তাঁর পরিচয়পত্র ফেরত নেওয়ার জন্য। তখন একজন মহিলা সীমান্তরক্ষী রাহিলার সকল জিনিসপত্র পরীক্ষা করেন এবং সেখানে তিনি কাঁচা গোমাংসের সন্ধান পান। এই দেখেই ঐ সীমান্তরক্ষী তাকে সকলের সামনে অকথ্য গালিগালাজ করতে শুরু করেন। রাহিলা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তিনি শুধুমাত্র ঈদের পরবে তাঁর সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য ঐ গোমাংস কিনেছেন। কিন্তু ঐ সীমান্তরক্ষী তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত না করে রাহিলাকে ধাক্কা মেরে ফেলে

দিয়ে তাঁর পেটে নির্বিচারে লাথি মারতে থাকেন। যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় রাহিলা সেখানেই জ্ঞান হারান। এর একদিন পর অর্থাৎ ২২ শে জুলাই রাহিলা কিছুটা সুস্থ হলে জলঙ্গী পুলিশ স্টেশনে উক্ত সীমান্তরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে যান। থানার ডিউটি অফিসার রাহিলার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্য বলেন "তোমরা সীমান্তে যারা থাকো সবাই চোর।" রাহিলা এতেও দমে না গিয়ে বিচারের আশায় গত ২৩ শে জুলাই ২০২১ এ মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপারের কাছে এক লিখিত অভিযোগ পাঠান, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, আজও সেই অভিযোগ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করা হয়নি।

আজ প্রশ্ন একটাই, কোন আইন ভাঙ্গার জন্য রাহিলাদের মত হাজার হাজার মানুষকে শারিরীক নির্যাতন সহ্য করতে হয়? উত্তর একটাই তাঁদের অপরাধ তাঁরা সীমান্তবাসী। বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের (মাসুম) তথ্য অনুযায়ী গত বছরে কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা এবং কোচবিহারের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এইরকম ২২ খানি ঘটনার অভিযোগ উঠে এসেছে। কিন্তু এইরূপ ঘটনা প্রতিদিন , প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সীমান্তবর্তী এলাকায় কিন্তু সীমান্তবাসীরা বিচারের আশা ত্যাগ করে যন্ত্রণা সহ্য করে নেন।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখা ভালো যে কাঁটাতার স্থাপনের এই সমস্যার কারণে প্রায় হাজারের অধিক মানুষের বাসস্থানটুকুও পরে গেছে কাঁটাতারের ওইপারে। সেই মানুষদের কারাগারসম জীবনযন্ত্রণা অকল্পনীয়। দিনে ৩ বার যখন এক ঘন্টা করে গেট খোলা হবে কেবলমাত্র তখনই তাঁরা বাইরে বেরোতে পারবেন বা বাইরে থেকে ভিতরে আসতে পারবেন। এরমধ্যে মা এর প্রসব বেদনাই উঠুক বা অন্য জরুরী দরকার থাকুক, গেট নির্দিষ্ট সময়ের আগে খোলা হবেনা।

কিন্তু এত নিয়মের বেড়াজাল কীসের জন্য? কেবলমাত্র সীমান্ত সুরক্ষা? সীমান্তরক্ষীদের প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেন সীমান্তে বেআইনী অনুপ্রবেশ এবং পাচার আটকানোই মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতেও তো অঙ্ক মেলেনা। আইন অনুযায়ী সীমান্তরক্ষীরা পাহারা দেবেন প্রকৃত সীমান্তে। কিন্তু সীমান্তরক্ষীরা তো সেখানে নেই। তাঁরা আছেন কাঁটাতারের এইপারে, গ্রামের ভিতরে। তাই প্রকৃত অর্থে সীমান্ত আছে অসুরক্ষিতই। সেখানে বাংলাদেশ থেকে কোন মানুষ বা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর (BGB) সদস্যরা ভারতীয় ভুখন্ডের মধ্যে ঢুকে পরলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে তার কোন খবর থাকেনা।

ঘটনা - ৩

মালদা জেলার কালিয়াচক থানার অধীনে চকমিলপুর হল একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম। গ্রামটির মধ্যে ২০ টি পরিবার কাঁটাতারের অপর পারে বসবাস করতে বাধ্য থাকেন। এরই মধ্যে একটি পরিবারে বসবাস করতেন ৬৭ বছর বয়সী কাদের শেখ এবং ৬২ বছর বয়সী আলেকনুর বিবি। কাঁটাতেরের অপর পারে বন্দীদশার মধ্যেই দিন কাটছিলো তাঁদের। ঐ প্রান্তেই কাদের শেখের কিছু জমি ছিলো তাতেই চাষবাস করে দুজনের দিন গুজরান হতো। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর (২০১৭) রাত্রি ১.৩০ টা নাগাদ কাদের শেখ এবং

আলেকনুর বিবি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ কিছু বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী (BGB) তাঁদের বাড়িতে ঢুকে তাঁদের সেখান থেকে তুলে নিয়ে বাংলাদেশে চলে যান। স্বাভাবিক ভাবেই সম্পুর্ণ ঘটনাটি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অগোচরেই ঘটে। পরদিন অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর সকালে ঘরের মধ্যে বাবা মা কে না পেয়ে তাঁদের পুত্র মহবুল মিয়াঁ গোলাপগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি তে একটি লিখিত অভিযোগ করেন কিন্তু উক্ত পুলিশ ফাঁড়ি তার প্রাপ্তি স্বীকার করেনা এবং তার জন্য কোন তদন্তের কাজও শুরু করেনা। এর পর মহবুল মিয়াঁ ঐ দিনেই মালদার পুলিশ সুপারের কাছে এবং সাশানি বি এস এফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডান্টের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। ১৯ শে সেপ্টেম্বর এবং ২১ শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় এবং বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিজেদের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং করলেও এই ঘটনার কোন কিনারা করতে পারেন না।

বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ সেই ঘটনার কথা বেশ কিছুদিন পর জানতে পেরে ১৩ই অক্টোবর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করে। এর প্রায় ১ মাস পর ৬ই নভেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই অভিযোগের প্রাপ্তি স্বীকার করে এবং জানান এ বিষয়ে তদন্তের জন্য তাঁরা স্বরাষ্ট্র দপ্তর কে দায়িত্ব দিয়েছেন। এর প্রায় ২ বছর পরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছ থেকে উত্তর আসে যেখানে তাঁরা জানান স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তদন্ত অন্যযায়ী ষাটোর্ধ ঐ দুই মানুষ চোরাচালানকারী এবং তাঁরা ঐ দিন আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করছিলেন। সেই কারণে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাঁদের গ্রেফতার করে এবং বাংলাদেশের শিবগঞ্জ থানায় তাঁদের চালান করা হয় এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের আদালতে তাঁদের বিষয়টি বিচারাধীন অবস্থায় আছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই তদন্তের তীব্র সমালোচনা করে বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে পুনরায় তদন্তের অনুরোধ জানায়। কমিশন সেই মত পুনরায় তদন্ত শুরু করে। এরও ২ বছর পর ৫ই নভেম্বর ২০২১ এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি উত্তর পাঠায় এবং তাতে বলেন বাংলাদেশের উক্ত আদালতে ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ২০২০ তে তাঁরা দুজনেই বেকসুর খালাশ পেয়ে যান। কিন্তু কেবল আকলেনুর বিবিই ছাড়া পান, কাদের শেখ কে বিনা অপরাধে হাজতবাস করে যেতে হয়। এর ১০ মাস পরে জেল হেফাজতে থাকাকালীন অসুস্থ বোধ করেন এবং ১৫ ই ডিসেম্বর ২০২১ এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এরপরেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পুরো ঘটনাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন বিষয় না পেয়ে কেসটি বন্ধ করে দেয়। এই পুরো ঘটনা থেকে বেশ কিছু দিক আমাদের সামনে উঠে আসছে —

১. আলেকনুর বিবি ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০২০ তে ছাড়া পাচ্ছেন এবং কোন পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়া বিনা বাধায় ভারতের ভুখন্ডে তার বাড়ি ফিরে আসতে সক্ষম হচ্ছেন। আবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫ ই ডিসেম্বর ২০২১ এ কাদের শেখ মারা যাওয়ার পর আলেকনুর বিবি আবার বাংলাদেশ গিয়েছিলেন এবং রাজশাহী মেডিকেল

কলেজ থেকে কাদের শেখের মৃতদেহ নিয়ে তা বাংলাদেশের মাটিতেই কবর দিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। এই ক্ষেত্রেও আলেকনুর বিবির যাতায়াতে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীরা বাধা দান করেনা।

২. কাদের শেখ এবং আলেকনুর বিবি বেকসুর খালাস পাওয়ার পরেও কাদের শেখকে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের জেল হেফাজতে জান খালাশ রূপে পরে থাকেন। আজ কাদের শেখের মত হাজার হাজার ভারতীয় মানুষ জান খালাশ রূপে বাংলাদেশের কারাগারে বন্দী জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। এদের প্রত্যেকের সাজার মেয়াদ বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাও এদের বন্দীজীবন শেষ হয়না। একই চিত্র এই দেশেও বর্তমান। এখানকার সংশোধানাগারেও প্রচুর বাংলাদেশী মানুষ জানখালাশ রূপে বন্দীজীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। দুই দেশের সরকার এই মানুষদের মুক্তির বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনা।

এবার আসি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আরো এক অজুহাতের কথায় যেখানে তাঁরা বলে থাকেন সীমান্তে বেআইনি পাচার রোধ করার জন্য তাঁরা সীমান্তবাসীদের উপর বিভিন্ন নিয়ম চাপিয়েছেন।

বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম) প্রায় ২৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ – বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্তবাসীদের অধিকারের দাবীতে কাজ করে চলেছেন। মাসুম বিগত ২৪ বছরে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার এই বেআইনি পাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। তাঁদের মতে এই পাচার কখনই সম্ভবপর হয়না যদিনা রাষ্ট্র তথা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক বিভাগের মানুষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত না থাকতো।

কেমন আছেন সীমান্তের মানুষরা

সঠিক পরিসংখ্যান জানা না গেলেও কাঁটাতারের ওপারে বা বিএসএফ প্রহরার ওপারে, ভারতীয় ভূখন্ডে আনুমানিক ৫০,০০০-এর মতো পরিবার বাস করেন। এই সব পরিবারের বিবাহযোগ্য যুবক-যুবতীদের বিবাহ নিজেদের মধ্যেই করতে হয়। মূল ভূখন্ডের ভারতীয় নাগরিকরা কেউই ঐ এলাকার মানুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চান না। ওখানে বিবাহ করতে গেলে, শ্বশুরবাড়ি যেতে গেলে কাঁটাতারের গেটে বিএসএফ প্রহরীর মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়। সাথে হিন্দিতে গালিগালাজ উপরি পাওনা। আপনার আর্থিক ক্ষমতা থাকলেও বিবাহে বা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে কতজন মানুষকে নিমন্ত্রন করা হবে কত খাদ্যবস্তু কিনতে হবে তা সবই নির্ভর করছে বিএসএফের মর্জির ওপর। এবং অবশ্যই বহিরাগত সকল মানুষকে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে বেড়িয়ে যেতে হবে।

বেআইনী পাচার – বিচার বহির্ভুত হত্যা – দেহ লোপাট

পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ সীমান্তে যেসকল জিনিসপত্র পাচার হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল গরু। প্রত্যেক সীমান্তবর্তী জেলায় প্রায় শতাধিক 'ঘাট' আছে, যার মধ্যে দিয়ে

প্রতি দিন হাজার হাজার গরু ভারতবর্ষ থেকে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। এইবার বিষয় হলো এত গরু আসছে কোথা থেকে? এই গরু গুলি কী সবই সীমান্ত নিকটবর্তী অঞ্চলের গরু? এই সকল গরু এই রাজ্যেরও নয়। কারণ এই সকল গরু গুলির গড় উচ্চতা হলো প্রায় ৫ ফুট। এই সকল গরুগুলি আসছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা থেকে। এবার স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে যে এই এত পরিমাণ গরু সুদুর রাজ্যগুলি থেকে আসছে কীভাবে? এগুলি আসছে বড় বড় লরি বা ট্রাকের মাধ্যমে। তাহলে সবার চোখে ধূলো দিয়ে এতগুলি গরু বাহক ট্রাক বা লড়ি এত গুলি রাজ্য পার করে কীভাবে এই রাজ্যে একেবারে সীমান্ত এলাকার মধ্যে চলে যাচ্ছে? এর উত্তর একটাই- এগুলি কারুর চোখে ধূলো দিয়ে আসছেনা। এতোগুলো রাজ্যের পুলিশের ডিজি, জেলাগুলির এসপি, থানাগুলির ওসি/এসএইচও সকলেই তারা তাদের কাজে ব্যস্ত। সকলের চোখের সামনেই গরু পাচার চলছে যেমন চলছে মানব পাচার। রাজ্য পুলিশ ছাড়াও বিএসফের গোয়েন্দা বাহিনী, সিবিআই, সিআইবি, র, এনআইএ ইত্যাদি প্রভৃতি হাজারো রকমের বাহিনী আছে যাদের দুর্নীতি, অপরাধ রোধ করার জন্য ভারতীয় জনগণের পকেট থেকে টাকা কাটা হচ্ছে। ভিন রাজ্য থেকে গরু আসছে প্রকাশ্য দিবালোকে, সকল চেকিং পোষ্ট পার করে। প্রত্যেক ট্রাক বা লরি ড্রাইভারের কাছে কিছু চিরকুট থাকে। যেটি দেখালেই তাদের কোন এগিয়ে চলায় কোন বাধা আসেনা এবং এই ক্ষেত্রে রাজ্যের পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট ভালো বোঝাপড়াও আছে। কিন্তু এই ভাবে প্রশাসনিক দপ্তরের প্রকাশ্য মদতে কেন এই বেআইনি কাজ দিনের পর দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে? এর কারণ মাসুমের মতে শুধুমাত্র গরু পাচারের ফলে প্রতিদিন ১০-১৫ কোটি টাকার মুনাফা হচ্ছে এবং এর ভাগ কলকাতা থেকে দিল্লী সর্বত্রই বন্টন হচ্ছে। কিন্তু সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের তো দেখাতেই হবে যে তারা এই কাজ বন্ধ করার জন্য কতটা বদ্ধপরিকর। তাই মাঝে মাঝেই দৈনিক সংবাদ মাধ্যমে ছোট করে একটি খবর চলে আসে "সীমান্তরক্ষীর গুলিতে এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে"। এই পাচারকারীরা কারা? এরা কেউ বাইরের লোক নয় এরা সেই সীমান্ত এলাকারই কোন গ্রামের লোক। যিনি দৈনিক ৩০০-৫০০ টাকা উপার্জন করার জন্য এই কাজে নেমেছিলেন। বিএসএফও যে পাচারের কাজে যুক্ত তা শুধু আমাদের বক্তব্য নয়, এটা ভারত সরকারের এন আই এ-র ও বক্তব্য। বিএসএফের ব্যাটেলিয়ানের কর্তারাও এই অপরাধে যুক্ত তা ভারত সরকার নিজেই বলছে।

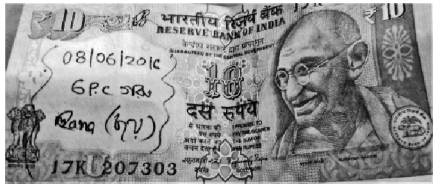

ঘটনা - ৪

১৯ বছর বয়সী হাফিজুল শেখ মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার অন্তর্গত নবিরপাড়া গ্রামের একটি ছেলে। ইসলামপুরের আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল সে। পরিবারের চাষযোগ্য কিছু জমি থাকলেও সীমান্তরক্ষীদের নিয়মের জাঁতাকলের মধ্যে পরে গিয়ে সেই জমি চাষ করে কোন লাভ হতোনা বরং দিনের পর দিন অর্থনৈতিক অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হতে থাকে। এই অর্থকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হাফিজুল গরু পাচার করার জন্য নিজের নাম নথিভুক্ত করে।

গত ২০/৭/২০২০ তারিখে সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ সে সেই উদ্দেশ্যে কাহারপাড়া ব্রীজের কাছ থেকে আরো ৬ জনের সাথে যুক্ত হয়ে গরু পাচারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। উক্ত দলের মধ্যে ৩ জন বাংলাদেশীও ছিল। রাত্রি ১০টা বেজে গেলেও হাফিজুল যখন বাড়ি ফেরেনা, তখন তার পরিবারের লোক তার খোঁজ নিতে শুরু করে এবং তার দাদা সাজিদ শেখ হাফিজুলের বন্ধুদের থেকে জানতে পারেন যে তার ভাই গরু পাচার করতে গেছে। এই শুনে সাজিদ তার ভাইকে আটকানোর জন্য হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন এবং রাত্রি ১১ টা নাগাদ সে যখন কাহারপাড়া ব্রীজের কাছে এসে পৌছান, তখন সীমান্তবর্তী এলাকায় লাগানো উজ্জ্বল আলোয় সাজিদ দেখতে পান যে তার ভাইকে এবং ৬ জন বাকি সাথীদের কিছু সীমান্তরক্ষী আটকে রেখেছে। প্রকৃত সীমান্ত থেকে ৫ কিলোমিটার ভিতরে তাদের আটকানো হয়েছে। ভয়ে সাজিদ ব্রীজ থেকে নেমে পাটের ক্ষেতে লুকিয়ে পরেন। সেখান থেকে তিনি পরিস্কার দেখেন যে সীমান্তরক্ষীরা ঠান্ডা মাথায় তার ভাই কে এবং বাকি ৬ জন সাথীকে গুলি করে। এরপর তাদের নিথর দেহগুলি নিয়ে পদ্মার নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

এই ঘটনা দেখে সাজিদ কোনপ্রকারে নিজের বাড়ি ফিরতে সক্ষম হয় এবং পুরো ঘটনাটি তার পরিবার কে জানায়। পরদিন অর্থাৎ ২১/৭/২০২০ তারিখে হাফিজুলের পিতা আত্তাজ মন্ডল রানীনগর থানায় যান এবং গিয়ে পুরো ঘটনাটি লিখিত ভাবে অভিযোগ আকারে দায়ের করেন। রানীনগর থানার পুলিশ সেই অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে এবং রীতিমত হুমকি দেন যে এই অভিযোগ আনলে তাদের পরিবারের সমুহ বিপদ আসন্ন। শেষ পর্যন্ত ঐ অফিসার হাফিজুলের নামে কেবলমাত্র এক "মিসিং ডায়েরী" নথিবদ্ধ করেন। কিন্তু শুধু নথিবদ্ধের কাজ টুকুই হয়, এ বিষয়ে কোন তদন্ত হয়না। মাসুম এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে এক অভিযোগ দায়ের করে। এর প্রায় ৫ মাস পর ২৩/২/২০২১ তারিখে এই অভিযোগটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গ্রহন করে এবং এর দুই দিন পরেই উক্ত কেসটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে নিজেদের ঘার থেকে নামিয়ে ফেলেন। তারপর থেকে আজ প্রায় ১ বছর হতে চললো, কিন্তু এই বিষয়ে কোন তদন্তের কাজ আজপর্যন্ত শুরু হলোনা। উল্টে দোষী সীমান্তরক্ষীরা আজও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

পাচার-এনডিপিএস এবং দেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা

আজ হাফিজুলের মত শত শত মানুষের জীবনের মুল্যে এই অসাধু ব্যাবসা বছর বছর চলতে থাকে। সরকার পাল্টায়, রাজনীতির রঙ পাল্টায় কিন্তু এই বেআইনী পাচারের কাজ চলতেই থাকে। কিন্তু এই পাচারের বড় মাথারা থাকেন অন্তরালেই। তাদের গায়ে কোন আঁচরটুকুও লাগেনা। আমরা শুধু খবরের কাগজের ঐ পাঁচ লাইনের খবরটিই পড়ি এবং ধারণা করে নিই আমরা কতটা সুরক্ষিত।

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার অর্থ হলো সমাজে এমন এক বিধি ব্যবস্থা চালু করা যার দ্বারা সমাজে অপরাধ নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থাকে। ফলে এই ব্যবস্থার মধ্যে পুলিশের সাথেই আদালত, কারা বিভাগ, প্রসিকিউশন সকলেই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কোন এক পক্ষ যদি স্বীয় কাজ বা দায়িত্ব পালন না করে তার প্রভাব অন্যন্য পক্ষগুলির ওপর পড়ে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থাই আক্রান্ত, ক্ষয়রোগাক্রান্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এবং এর সামগ্রিক প্রতিফলন সমাজে তথা জনসাধারণের ওপর পরে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নাগরিককে রক্ষা করা। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, তাকে ব্যবহার করে অপরাধীদের আড়াল করলে বা নির্দোষ ব্যক্তিদের অপরাধী সাজানর প্রচেষ্টা চালালে তা সর্ব অর্থেই দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত।

গরু পাচারের সাথে সাথেই সীমান্ত এলাকা দিয়ে ফেন্সিডিলও প্রচুর পরিমানে পাচার হয়। ফেন্সিডিল হল একপ্রকার কাশি নাশক ঔষধ। কিন্তু প্রশ্ন হল এই ঔষধ কেন পাচার হয়? বাংলাদেশে প্রধানত ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। মদ্যপান সেখানে আইনত সম্ভব নয়। তাই নেশার দ্রব্য হিসাবে ফেন্সিডিলের খুবই চাহিদা বাংলাদেশে। সেই পাচারের চক্রেও বড় মাথা দের কখনো দেখতে পাওয়া যায়না। ধরা পরে কেবল সাধারণ সীমান্তবাসী যারা রোজ ২০০-৩০০ টাকার বিনিময়ে সারা শরীরে ৩০-৪০ টি ফেন্সিডিলের শিশি বেঁধে বাংলাদেশে পাচার করছে। যারা ধরা পড়ছে তাঁদের তো নির্বিচারে Narcotics Drugs Psycotropic Substance (NDPS) এ কেস দেওয়া হচ্ছেই এর সাথে সাথে আরো মানুষদের বিরুদ্ধে সেই কেস দেওয়া হচ্ছে যাদের এই সব বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্কই নেই। আজ সীমান্তবাসীরা সবসময়েই আতঙ্কিত থাকেন এই কেসে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে। শুধু কেস দেওয়া তো মূল উপলক্ষ নয়, এর পরেই পুলিশ আধিকারিকরা তাঁদের কাছে ঘুষ খাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকবে। সীমান্তবাসীরা ঘর বাড়ি বেচে সেই টাকা দিয়ে কোনমতে নিজেদের ছাড়ানোর বন্দোবস্ত করেন। যারা পারেননা তারা বিনা অপরাধে হাজতবাস করেন।

বর্ডার হাট

বিগত ইউপিএ সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় সরকার তার স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও বৈদেশিক বিভাগ সহমত হয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাচার রোধে প্রতিবাশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষায় এবং দুই দেশের জনগনের সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এই সীমান্তে বাজার বা হাট খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত আজও অপরবর্তিত আছে। কিন্তু বর্তমান এনডিএ সরকার এই সিদ্ধান্ত পালনে

ইচ্ছুক নয়। তাই সীমান্তে বর্ডারহাট করার ঘোষণা কেবলমাত্র কাগজেই থেকে গেছে, বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। আমরা মনে করি এই সীমান্তে বেআইনি পাচার অনেকটাই রদ করা যায় "বর্ডার হাট" এর মাধ্যমে। এই বর্ডার হাট হল সীমান্ত এলাকার সরকারী কেনা বেচার কেন্দ্র যেখানে দুই দেশের মানুষ আসবেন নিজেদের এলাকার জিনিস পত্র কেনা বেচার জন্য এবং পুরো ঘটনাটি ঘটবে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পাহারার মধ্যে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের সীমান্তে ৪ খানি বর্ডার হাট ছিল। সেই সকল হাটে দুই দেশের সীমান্তবাসীরা শান্তিপূর্ণ ভাবেই জিনিসপত্রের বেচা কেনা করেন। এতে সরকারের ভাঁড়ারেও টাকা ঢোকে। মাসুম বিগত বছরে বারংবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ সীমান্তে বর্ডার হাট খোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু সে প্রস্তাব কখনই না রাজ্য সরকার না কেন্দ্র সরকার গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না কেন এই প্রস্তাব গুরুত্ব পায়না। তাহলে তো এই লক্ষ কোটির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেটি কিছু মানুষ নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে রেখেছেন।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের নিষ্ক্রিয়তা – ভিন রাজ্যে পরিযান - অতিমারির কোপ

আমরা কি কখনো প্রশ্ন করি যে আজ কেন এই সীমান্তবাসীরা চোরাচালানের সাথে যুক্ত হচ্ছে? কে নিজের ইচ্ছায় এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে চায়? কিন্তু তাও তারা সেই কাজ কে পেশা বলে গ্রহণ করছে। এর কারণ তাদের এই কাজ করতে বাধ্য করানো হচ্ছে। যদি কেউ সীমান্ত এলাকায় যান তবে দেখবেন যে এলাকাগুলি কতটা পিছিয়ে আছে। সরকারী প্রকল্পের কোন সুযোগ এদের জন্য নয়। এখনো সীমান্তবর্তী প্রচুর গ্রাম আছে যেখানে বিদ্যুৎ পর্যন্ত পৌছায়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মুর্শিদাবাদের রানীনগর থানা অন্তর্গত চর এলাকায় স্বাধীনতার পর থেকে বিদ্যুৎ আসেনি। বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের সাথে চর এলাকার মানুষদের আবরাম আন্দোলনের ফলে ২০১৩ সালে সেই এলাকায় বিদ্যুৎ প্রবেশ করে। রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ কে "নির্মল বাংলা" বলে ঘোষণা করলেও সীমান্ত এলাকায় প্রায় বেশীরভাগ মানুষের বাড়িতে শৌচালয় পর্যন্ত নেই। রাজ্য সরকারের কৃষক বন্ধু প্রকল্প, খাদ্যসাথী প্রকল্প। নিজ ভূমে নিজ গৃহ প্রকল্প, কর্মসাথী প্রকল্প, নিজশ্রী হাউজিং প্রকল্প, স্নেহালয় প্রকল্প, সুফল বাংলা প্রকল্প, উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্প, যুবশ্রী প্রকল্প পশ্চিমবাংলার সীমান্তে কাজ করে না। এছারাও কেন্দ্রীয় সরকারের আরো গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্প আছে। তাতে কোটি কোটি টাকাও আছে। শুধু সীমান্তে এইসব প্রকল্প কার্যকরী হবেনা, হলেও বিশেষ কিছু মানুষের জন্য হবে। রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই, স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, চাকরী নেই, উন্নয়ন নেই। এখানে সবাই নেই রাজ্যের বাসিন্দা। আছে বলতে বিএসএফের নির্যাতন, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, প্রশাসনের অন্ধত্ব, মানুষের পরনির্ভরতা আর বাঁচার রাস্তা,

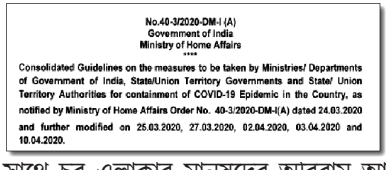
No.40-3/2020-DM-I (A)
Government of India
Ministry of Home Affairs
****
Consolidated Guidelines on the measures to be taken by Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities for containment of COVID-19 Epidemic in the Country, as notified by Ministry of Home Affairs Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 24.03.2020 and further modified on 25.03.2020, 27.03.2020, 02.04.2020, 03.04.2020 and 10.04.2020.

একমাত্র চোরাকারবার।

সীমান্তবাসীদের কাছে চাষের জমি থাকলেও বি এস এফের বাধায় সেই জমিতে চাষ করা তাদের কাছে কী সমস্যায় পরিণত হয়েছে তার আলোচনা আগেই হয়েছে। সেই জমি তারা অভাবের তাড়নায় বেচতেও পারেন না। কারণ কেউ সেই জমি কেনেনা। কেউই সীমান্তের জমি কিনে নিজের লোকসান বাড়াতে চাননা। তাহলে তারা করনেন কী? খাবেন কী? বাঁচবেন কীভাবে? তাই অনেকে সীমান্ত এলাকা থেকে অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক রূপে পাড়ি দিচ্ছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনও কম ঝুঁকিপূর্ণ নয়। মাসুম এরকম বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী যেখানে সীমান্ত এলাকার মানুষেরা ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে কোন দুর্ঘটনায় নিজের প্রাণ হারিয়েছেন বা কেউ কেউ দালাল চক্রের বশবর্তী হয়ে নিজের সর্বস্ব হারিয়েছেন। এর পাশাপাশি ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হল অতিমারীর প্রভাব। সারা দেশকে তালাবন্দী করে দেওয়া হল। সেই সময়ে লক্ষাধিক অসংগঠিত পরিযায়ী শ্রমিকদের কী দুর্দশা হয়েছিল তা কারুর অজানা নয়। রেলপথে রুটির উপর সেই রক্তের দাগ কোনদিন উঠবেনা। প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল শুধু বাড়ি ফেরার জন্য। সেই তালিকাতে সীমান্তবাসীরাও ছিল। সেই সময়তেই উত্তর ২৪ পরগণা এবং কোচবিহারের প্রায় শতাধিক সীমান্তবাসী কর্ণাটক এবং কেরালায় বন্দী অবস্থায় পরে ছিলেন। অবশেষে মাসুমের সৌজন্যে উক্ত রাজ্যের বন্ধুদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই মানুষদের ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়। শুধুমাত্র পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থা নয়। সীমান্তের সাধারণ কৃষিজীবিদেরও না খেতে পেয়ে মারার জায়গায় নিয়ে গেছিলো সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা। যেখানে ১৫ই এপ্রিল ২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে ঘোষনা করা হচ্ছে (Memo no-40-3/2020-DM-I(A)) লকডাউনের মধ্যে কিছু অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবা বন্ধ করা যাবে না এবং সেই তালিকার ৬ নম্বরে কৃষিকাজের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু ঐ সময় সীমান্তরক্ষীরা গেট বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। শত অনুরোধেও সেই দরজা খোলার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা। সীমান্তবাসীরা গেটের সামনে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ধর্ণায় বসলেও তাদের টলানো যায়নি। কারণ তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তারা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশকেও মান্যতা দেয়না। অথচ এই বাহিনীর জন্য হাজার কোটি টাকা যে বরাদ্দ হয় সেই টাকা আসে আমাদের ট্যাক্সের টাকায়।

তাহলে এই সীমান্তবাসীরা কী করবেন? ভারতের সংবিধানে ২১ নং অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার রূপে জীবনের অধিকারের কথা বলা থাকলেও সীমান্তবাসীদের জীবন মনে হয় সেই আওতায় পড়েনা। তাদের জীবন ধারণের সকল অবলম্বন সহজেই কেড়ে নেওয়া যায়। এই কারণেই তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেআইনী পাচারের সাথে নিজেকে নিযুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সমাজের চোখে একজন দুস্কৃতি রূপে পরিগনিত হচ্ছেন।

কেন্দ্র, রাজ্য সরকার – পঞ্চায়েত : কোন ফারাক নেই

অনেকেই এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আগেই সীমান্ত রক্ষীর হাতে নির্যাতনের বিষয়ে রাজ্য সরকার পরিচালিত পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার

কথা উল্লেখ করেছি। অন্যান্য দপ্তরের অবস্থানও তথৈবচ। প্রকৃত অর্থে সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা কিছু নেই বললেই চলে। বাস্তবত, এই এলাকাগুলিতে মানুষের জীবন-জীবিকা, শান্তি, আইনশৃঙ্খলা, খেলাধুলা সব কিছুই প্রকারান্তরে নিয়ন্ত্রন করছে বিএসএফ। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের ১৬ (খ) ধারা অনুযায়ী নিয়মিত গ্রামসভার

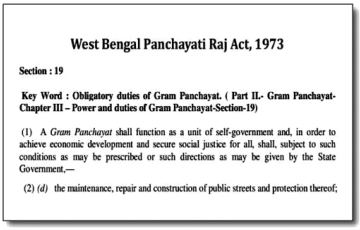

West Bengal Panchayati Raj Act, 1973

Section : 19

Key Word : Obligatory duties of Gram Panchayat. (Part II.- Gram Panchayat-Chapter III – Power and duties of Gram Panchayat-Section-19)

(1) A *Gram Panchayat* shall function as a unit of self-government and, in order to achieve economic development and secure social justice for all, shall, subject to such conditions as may be prescribed or such directions as may be given by the State Government,—

(2) *(d)* the maintenance, repair and construction of public streets and protection thereof;

মিটিং হওয়ার কথা, কিন্তু সীমান্ত এলাকায় তা হয় না। পঞ্চায়েত আইনে (১৯(২)(ঘ)) ধারায় নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সকল রাস্তাঘাট, তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং চলাচলের বাধা অপসারণ করা সেই পঞ্চায়েতের দায়িত্ব। কিন্তু সীমান্তবর্তী পঞ্চায়েত এলাকায় একমাত্র পাকা রাস্তাটি বি এস এফ-এর দখলে। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের প্রচুর অভিযোগ থাকলেও সে বিষয়ে কোন সুরাহা হয়না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমান্তে পঞ্চায়েত কোন কাজ করতে গেলে সেখানেও তাদের সীমান্তরক্ষী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। আই সি ডি এস কর্মীদের এতবার সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়েছে যে তারা এখন সীমান্ত এলাকায় যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন। এই বিষয়ে এলাকার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমাশাসক এমনকি জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ গেলেও সেগুলি নিয়ে কোন তদন্তের কাজ হয়না বরং পরোক্ষ ভাবে সীমান্তরক্ষীদের এই বাধা দেওয়ার কাজে তাদের সাহায্য করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সীমান্তরক্ষীদের এই বাধার ব্যাপারে কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন তখন বলা হয় ১৪৪ ধারা জারি আছে। এই ১৪৪ ধারা জারি করছে জেলা শাসক বা কোথাও কোথাও মহকুমা শাসকও। ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারায় পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করে বলা আছে এই আইন টানা ৬০ দিনের বেশী প্রয়োগ করা যাবেনা, কিন্তু সীমান্ত এলাকা তে প্রতি ৫৯ দিনের মাথায় পরবর্তী আরো ৬০ দিনের জন্য এই আইন প্রণয়নের নির্দেশ জেলাশাসক

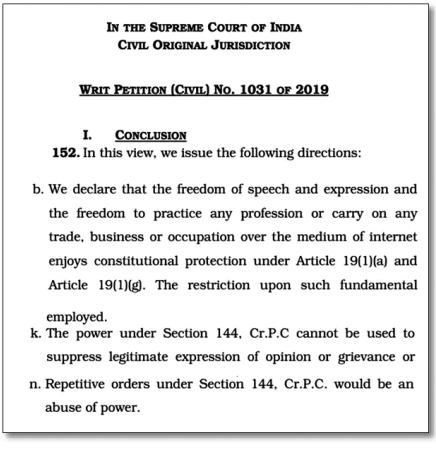

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 1031 OF 2019

I. CONCLUSION

152. In this view, we issue the following directions:

b. We declare that the freedom of speech and expression and the freedom to practice any profession or carry on any trade, business or occupation over the medium of internet enjoys constitutional protection under Article 19(1)(a) and Article 19(1)(g). The restriction upon such fundamental employed.

k. The power under Section 144, Cr.P.C cannot be used to suppress legitimate expression of opinion or grievance or

n. Repetitive orders under Section 144, Cr.P.C. would be an abuse of power.

বা মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে এসে যাচ্ছে। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় বছরের পর বছর ধরে এই নির্দেশ নামা জারি করা থাকে। এই বিষয়ে আবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশিকা জারী করেছে। কোনভাবেই কোন এলাকায় লাগাতার এই ধারা প্রয়োগ করা যাবে না। মানুষের চলাফেরা, মত প্রকাশের অধিকার — এগুলি সাংবিধানিক অধিকার; কেবলমাত্র জরুরী পরিস্থিতিতে এই ধারা

স্বল্পকালের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের আদেশ আমাদের দেশের আইন। সরকার এবং জনসাধারণ সকলেরই মান্য। অথচ যারা এই নির্দেশ দিচ্ছেন তারা একবারও সেই সীমান্ত এলাকার মানুষদের সাথে একবারও কোন আলোচনা করছেন না। তাদের সমস্যার কথা জানার চেষ্টা করছেনো না। দিল্লীর নর্থ ব্লক বা পশ্চিমবঙ্গের নবান্ন থেকে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রতিবছর যে লক্ষ-কোটি টাকা বরাদ্দ হয় তা দেশের সীমান্তে পৌঁছানোর আগেই ফুরিয়ে যায়।

বি. এ. ডি. পি. (Border Area Development Programme)

দেশের সীমান্ত এলাকা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বি. এ. ডি. পি. (Border Area Development Programme) প্রকল্প বহু বছর ধরে চালু করেছে। সেই প্রকল্পে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথা বলা আছে। যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কক্ষ নির্মাণ, বিদ্যালয়ের জন্য আবাসিক ঘর নির্মাণ, বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের সংস্কার, লাইব্রেরি নির্মাণ, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কেনা, সীমান্তবাসীদের জন্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন, চাষবাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়নমূলক কাজ, সীমান্ত এলাকা সংলগ্ন রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন , খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সীমান্ত এলাকায় অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের নির্মাণ, কমিউনিটি হল নির্মান এবং এই রকম আরো বিভিন্ন কাজের কথা সেখানে উল্লিখিত আছে। শুধুমাত্র এই সংক্রান্ত কাজের জন্য ২০২০-২০২১ আর্থিক বর্ষে ৭,৮৪,০০,০০০,০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। প্রকৃত সীমান্ত থেকে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকাতে উন্নয়ন করার জন্য এই টাকা। কিন্তু বাস্তবে বি. এ. ডি. পি.-র টাকা সীমান্তে প্রয়োজনীয় জায়গায় খরচ না হয়ে বিএসএফ ও প্রশাসনিক কর্তাদের অঙ্গুলি হেলনে তা ব্যয়িত হচ্ছে সামরিক বিভাগের উন্নয়নেই। সীমান্তবাসী মানুষের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে তা ব্যয়িত হচ্ছেনা। সেখানে সীমান্তে চাষ করতে যাওয়ার জন্য চাষিদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য একটি খাতা এবং একটি কলমও সীমান্তবাসীদেরই কিনে দিতে হয়। নইলে সীমান্তরক্ষীরা চাষিদের নাম নথিভুক্ত করবেন না এবং তাঁদের নিজেদের জমিতে চাষ করতে যেতে দেবে না।

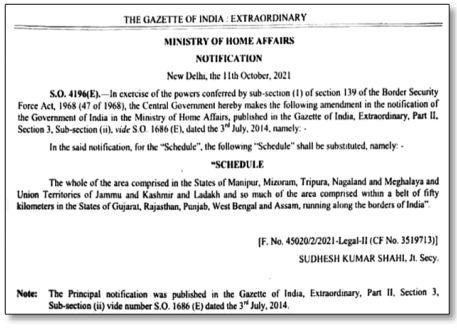

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 139 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1686 (E), dated the 3rd July, 2014, namely: -

In the said notification, for the "Schedule", the following "Schedule" shall be substituted, namely: -

"SCHEDULE

The whole of the area comprised in the States of Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland and Meghalaya and Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh and so much of the area comprised within a belt of fifty kilometers in the States of Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal and Assam, running along the borders of India".

[F. No. 45020/2/2021-Legal-II (CF No. 3519713)]

SUDHESH KUMAR SHAHI, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1686 (E) dated the 3rd July, 2014.

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অধিকারক্ষেত্রের বৃদ্ধি

পূর্বে আলোচিত সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের নির্যাতনের সকল ঘটনাই হয়েছে তাঁদের কর্মক্ষেত্র ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকাকালীন। সাম্প্রতিক কালে স্বরাষ্ট্র দপ্তর একটি বিবৃতি দিয়ে

জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও পাঞ্জাব এই তিনটি রাজ্যে বিএসএফ-এর কর্মক্ষেত্র ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে। গত ১১ ই অক্টোবর ২০২১ "The Gazette of India (Extraordinary)-এর S.O.4198 (E) তে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়, যেখানে কেবলমাত্র ৩ লাইনের এক বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর অতি চালাকির মাধ্যমে এত বড় সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে দেয়। যা এক অর্থে অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক এবং স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত। কেননা কেন্দ্র কোন আলোচনা ছাড়াই সরাসরি রাজ্যের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করল; দেশের সংবিধানে রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারের ক্ষমতা, এক্তিয়ার সবকিছুই পরিষ্কার করে দেওয়া আছে সংবিধানের তপশীলে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই ঘোষণা করার আগে কোনো রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করা হয়নি। লোকসভা বা রাজ্যসভায় কোনো আলোচনা করা হয়নি; একতরফা ভাবে বি এস এফের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। এর পরেই পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী তার বিবৃতিতে এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের চরম নিন্দা করেন এবং তার প্রতিবাদ করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক বিবৃতি দেন এবং গত ১৬ই নভেম্বর ২০২১ এ বিধানসভায় এর বিরোধী বিল পাশ হয়। তার পূর্বে, ১৫ই নভেম্বর কোলকাতা প্রেস ক্লাবে এই রাজ্যের বহু সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীগণ একত্রিত হয়ে বি এস এফের হাতে বাংলাদেশ সীমান্তের মানুষদের ওপর নির্যাতনের এবং সীমান্ত থেকে ৫০কিমি পর্যন্ত বি এস এফের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতিবাদ করা হয়। সেখানে সীমান্ত থেকে নির্যাতিত পরিবারের সদস্যরাও বক্তব্য ইয়ুলে ধরেন। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের এই বিবৃতির সারমর্ম অনুযায়ী সীমান্ত থেকে দেশের ভিতরে ৫০ কিলোমিটার অবধি বিএসএফ তাদের শাসন জারি করবে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পুরোটা এবং মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার বেশীরভাগ অংশ সীমান্তরক্ষীদের আওতায় পড়বে। এবার আর শুধু সীমান্তবাসী বলে নয় শহরাঞ্চলের মানুষের সামনেও পূর্ব উল্লিখিত বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায়না। এর সাথে বিএসএফ এর হাতে অনেকগুন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, তল্লাশি ও মালপত্র আটক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের উপর বিএসএফদের অত্যাচার বহুগুন বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে। পুলিশ ও বি এস এফের একই এলাকায় সম ক্ষমতা নিয়ে কাজে সাংবিধানিক জটিলতাও অবশ্যম্ভাবী।

বি এস এফের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া

ইতিমধ্যেই বি এস এফ বাহিনী কুচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে।

১৯৬৮ সালে বি এস এফ আইনের প্রবর্তন হয়। সেই আইনের মধ্যেই সীমান্তরক্ষীদের কী কী করণীয় এবং কী কী করণীয় নয় সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়। সেখানে কোন সীমান্তরক্ষী কোন অনৈতিক কাজ করলে তার কি কি সাজা হতে পারে তার বিবরণও আছে। তার কিছু অংশ আপনাদের সামনে রাখা হল —

বিএসএফ অ্যাক্ট/রুল ১৯৬৮-এর বিধি অনুযায়ী

যদি কোন বিএসএফ কর্মী লুঠতরাজ করার মনোভাব নিয়ে কোনো জায়গায় যায় তাহলে তার/তাদের ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে (ধারা ১৬/খ)। অথচ কর্তব্যরত বিএসএফ কর্মীদের দ্বারা সীমান্তবাসী মানুষের বাড়ি ভাঙচুর, লুঠতরাজ, চাষের জমির ফসল নষ্ট করার অসংখ্য অভিযোগ বিএসএফ-এর সদর দপ্তরে পরে আছে, যার কোন বিচার হয়না।

যদি কর্তব্যরত বা অন্য সময়ের বিএসএফ কর্মীকে মদ্যপ অবস্থায় দেখা যায় তাহলে তার/তাদের ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে (ধারা ২৬)। মদ্যপ নেশাগ্রস্থ বিএসএফ কর্মীদের বাদ দিলে বিএসএফ বাহিনী আর থাকবে কিনা তা সন্দেহ।

ভুল তথ্য বা ভুল নথিপত্রের কোন কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিএসএফ কর্মীর ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে (ধারা ৩৮)। বিএসএফ-এর মিথ্যা অভিযোগে সীমান্তের প্রতিটি থানায় শতশত মানুষ জেলের ঘানি টানছেন, অপরদিকে সংশ্লিষ্ট থানাও বিএসএফ-এর সৌজন্যে শতশত মানুষের বিরুদ্ধে এন. ডি. পি. এস.-এর মিথ্যা মামলা রুজু করছে বা মামলার ভয় দেখিয়ে অর্থোপার্জন করছে।

সীমান্তে বসবাসকারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্যে মালপত্র ক্রয় করার কাজে বিএসএফ বাধা দিতে পারে না। বিএসএফ-এর কাজ সীমান্ত পাহাড়া দেওয়া, নাগরিকের শান্তিপুর্ণ কাজ-কর্মে নাক-গলানো বিএসএফ-এর কাজ নয়। আমাদের (মাসুমের) সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ভারতে কর্মরত সকল বিএসএফ বাহিনীর ওপর এই নির্দেশ দিয়েছিল [অর্ডার নম্বর-১৫০১১/২০/২০১১-এইচ আর-২, তারিখ ০৭/০৪/২০১১, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (এইচ আর ডিভিশন) ভারত সরকার]।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগ কর্তৃক একটি নির্দেশিকা জারি হয় যার নম্বর ৬২-জে এল, তাং-১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে নির্যাতিত মানুষের ক্ষতিপূরণের একটি তালিকা স্থির হয়। বিশদে এই তালিকার নির্যাস নিম্নে দেওয়া হলঃ

নং	নির্যাতনের প্রকার	সর্বাধিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
১)	অ্যাসিড আক্রমণ	৩ লক্ষ
২)	ধর্ষণ	৩ লক্ষ
৩)	অপ্রাপ্তবয়স্কদের ওপর দৈহিক নির্যাতন	২ লক্ষ
৪)	মানব পাচারের শিকার এবং অন্য অপরাধ যেমন ডাইনি প্রথার শিকার ব্যক্তির পুনর্বাসন	১ লক্ষ
৫)	যৌন নির্যাতন (ধর্ষণ ব্যতিরেকে)	৫০ হাজার
৬)	মৃত্যু	২ লক্ষ
৭)	স্থায়ী অক্ষমতা (৮০% বা আরও)	২ লক্ষ
৮)	আংশিক ক্ষতি (৪০% থেকে ৮০%)	১ লক্ষ

নং	নির্যাতনের প্রকার	সর্বাধিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
৯)	শরীরের ২৫% এর অধিক দগ্ধ (অ্যাসিড আক্রমণ ব্যতিরেকে)	২ লক্ষ
১০)	ভ্রূণ নষ্ট হওয়া	৫০ হাজার

বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম) এখনো পর্যন্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রায় দুই হাজারের উপর অভিযোগ দায়ের করেছে যার শতকরা ৯০ ভাগের উপর অভিযোগ সীমান্তবাসীদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে, নারী কমিশনের কাছে, শিশু কমিশনের কাছে, তফশিলী জাতি কমিশনের কাছে অসংখ্য অভিযোগ জমা পড়েছে। এছারাও প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব সংশ্লিষ্ট জেলার এসপি এবং ডিএম-দের কাছে অভিযোগের পাহাড় জমেছে। সকল কর্তৃপক্ষই টুইডিলডাম আর টুইডিলডি। মাসুমের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের আগে অব্দি বেশীরভাগ অভিযোগের প্রাপ্তি স্বীকার অব্দি করা হয়নি। এরপর থেকে এই চিত্রটা কিছুটা পাল্টালেও তদন্তের নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হয়নি। অভিযোগ যার বিরুদ্ধে সেই সংশ্লিষ্ট বিভাগকেই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হতো এবং সেই তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতেই কেস বন্ধ করে দেওয়া হতো। সেই রিপোর্ট অভিযোগকারীর কাছে বেশীরভাগ সময় পাঠানোই হতোনা। এই নিয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ করে মাসুম। দিল্লীতে গিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে বারংবার দরবারও করা হয়। এর ফলে বিচার পুদ্ধতিতে কিছুটা হলেও নিরপেক্ষতা আসে। কিন্তু বিচার এখনো নিভৃতেই কাঁদে। এর মধ্যে কিছুটা আশার আলো সঞ্চার হয়েছে, যেখানে এখনো অব্দি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে ৫৭ টি অভিযোগে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ হয়। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। এর মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ নির্যাতিত বা তার পরিবারের কাছে পৌছায়নি।

আদালতের বিচার ব্যবস্থাও তথৈবচ। মাসুমের তথ্য অনুযায়ী গত ৭ বছর ধরে মাসুম দেড়শোর বেশী জনকে আইনী সহায়তা দিচ্ছে বিভিন্ন স্তরের আদালতের মাধ্যমে। সেখানেও কতিপয় কেস ছাড়া বেশীরভাগ কেস অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকে। বিচার অধরাই থাকে।

গত ১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২-তে কলকাতায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও বিএসএফ একটি আলোচনায় বসে ও ৮ দফা সিদ্ধান্ত নেয়। দেখা যায় বিএসএফ ভারতের সংবিধান, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশাবলী সম্পর্কে সম্যক অবহিত নয়। জানানো হয় সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। বিএসএফ বাহিনীর অমানবিক ও বেআইনি কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব বিএসএফ-এর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ প্রশাসনের। যদি সীমান্তবাসী মানুষদের উপর এই অত্যাচার, বঞ্চনা, নির্যাতন ক্রমাগত চলতেই থাকে তাহলে মানুষকে বাধ্য হয়েই তার প্রতিবাদ করতে হবে। এছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। সেই প্রতিবাদের রাস্তাকেই আজ একমাত্র উপায় বলে মনে করছে সীমান্তবাসীরা। বহু নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে আজ তাঁদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। আজ তারা গোষ্ঠিবদ্ধ হচ্ছে "আমরা

সীমান্তবাসী" নামে। বিভিন্ন সীমান্তবর্তী গ্রামে তারা দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের সাংবিধানিক অধিকারের দাবী জানাতে শুরু করেছে। কিন্তু আজ শুধু সীমান্তবাসী বলে নয় বিপদের মেঘ এখন সর্বত্রই। তাই বন্ধু আজ ঘরে বসে থাকার দিন শেষ। অধিকারের দাবীতে রাস্তায় নামা ছাড়া আজ কোন পথ খোলা নেই। সরকার বিভিন্ন ভাবে সাধারণ মানুষকে ঘরবন্দী করে রাখার চক্রান্ত করলেও আমাদের আওয়াজ তুলতে হবেই। অধিকার আজ ছিনিয়ে নেওয়ার পালা।

উত্তর ২৪ পরগণা – বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটা, গোবরডাঙ্গা, স্বরূপনগর, আমডাঙ্গা, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, মিনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ পুরোটা এবং বারাসাত সদরের কিছু অংশ

নদীয়া – করিমপুর, তেহট্ট, চাপড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, রাণাঘাট পুরোটা এবং কৃষ্ণনগর ও চাকদার কিছু অংশ

মুর্শিদাবাদ – ফরাক্কা, শমসেরগঞ্জ, সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা, ভগবানগোলা, রাণীনগর, জলঙ্গী পুরোটা

মালদা – বামনগোলা, হবিবপুর, মালদা সদর, ইংলিশবাজার, কালিয়াচক, পঞ্চানন্দপুর, ভগবানপুর পুরোটা

দক্ষিণ দিনাজপুর– কুশমন্ডি, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হিলি, বালুরঘাট, তপন – পুরোটা

সীমান্ত থেকে ৫০ কিমি এক্তিয়ার বাড়ানোর ফলে এই রাজ্যের বর্তমান চিত্র

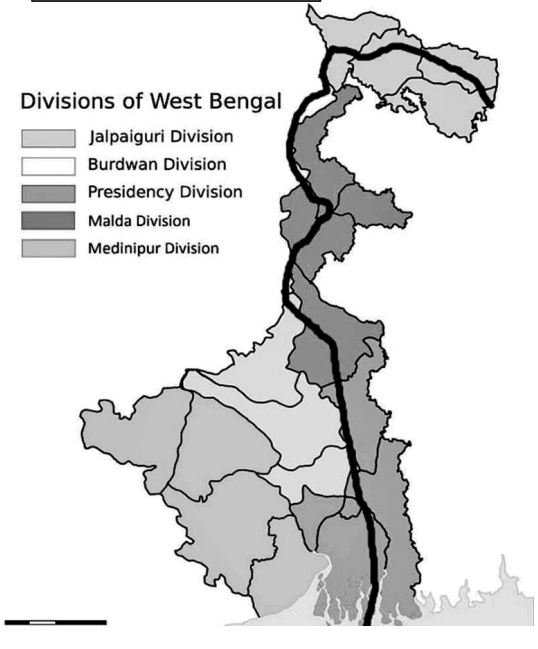

উত্তর দিনাজপুর – কেবলমাত্র ইটাহার ছাড়া পুরো জেলা

দার্জিলিং – ফাঁসিদেওয়া ব্লক

জলপাইগুড়ি – সদর ব্লক ও রাজগঞ্জ

কুচবিহার – হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি, দিনহাটা ও তুফানগঞ্জ এবং কুচবিহার সদরের একাংশ।

(সংযোজনী - ১)

No. 14051/14/2011-F.VI
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Foreigners Division)

Dated 1st May, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Advisory on preventing and combating human trafficking in India - dealing with foreign nationals.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 15011/6/2009-ATC (Advisory) dated 09.09.2009 on the above mentioned subject (copy enclosed). It has come to the notice of this Ministry that foreign nationals are associated in some instances of human trafficking among women and children.

2. Further to the detailed procedure outlined in the above mentioned Office Memorandum, it has been decided with the approval of the competent authority that in cases of foreign nationals who are apprehended in connection with human trafficking, the State Governments / UT Administrations may follow the following procedure : -

(i) Immediately after a foreign national is apprehended on charges of human trafficking, a detailed interrogation/investigation should be carried out to ascertain whether the person concerned is a victim or a trafficker.

(ii) The victims and the persons actually involved in human trafficking should be treated differently by the police authorities. This is in line with the SAARC Convention which advocates a victim-centric approach.

(iv) It is seen that in general, the foreign victims of human trafficking are found without valid passport or visa. If, after investigation, the woman or child is found to be a victim, she should not be prosecuted under the Foreigners Act. *If the investigation reveals that she did not come to India or did not indulge in crime out of her own free will, the State Government / UT Administration may not file a charge sheet against the victim. If the chargesheet has already been filed under the Foreigners Act and other relevant laws of the land, steps may be taken to withdraw the case from prosecution so far as the victim is concerned.* Immediate action may be taken to furnish the details of such victims to the Ministry of External Affairs (Consular Division), Patiala House, New Delhi so as to ensure that the person concerned is repatriated to the country of her origin through diplomatic channels.

3. All other instructions contained in this Ministry's Advisory dated 09.09.2009 including reporting to the Anti Human Trafficking Nodal Cell in MHA will be applicable in the case of foreign nationals associated with human trafficking, whether they are women or children(children means both boys and girls upto 18 years of age).

(G.V.V. Sarma)
Joint Secretary to the Govt. of India

(সংযোজনী - ২)

Extraordinary

Published by Authority

SRAVANA 30] WEDNESDAY, AUGUST 21, 2002 [SAKA 1924

PART I—Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

Government of West Bengal

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. 301-EMP/1M-10/2000 --21st August 2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (a) of section 3 of the West Bengal Regulation of Recruitment in State Government Establishments and Establishments of Public Undertakings, Statutory Bodies, Government Companies and Local Authorities Act, 1999 (West Bengal Act XIV of 1999), the Governor is pleased to declare following categories of persons as exempted categories for the purpose of the aforesaid Act :—

1. **Dependants of employees dying in harness :** A solely dependant wife/son/daughter/near relation of an employee who dies in harness leaving his family in immediate need of assistance.

A near relation of the deceased employee may be considered for employment on compassionate ground only when the son/daughter/wife of the deceased employee cannot be considered for employment owing to minor age or other disabilities. In such a case the employment of a near relation of the deceased employee may be considered only for providing assistance immediately needed by the family left behind by the deceased.

2. **Dependants of employees retiring incapacitated :** A solely dependant son/daughter/near relation of an employee who is disabled permanently or otherwise incapacitated rendering him unfit to continue in service and whose family is in need of immediate assistance.

A near relation of an employee, retiring incapacitated, may be considered for employment on compassionate ground when the son/daughter/wife of that employee cannot be considered for employment owing to minor age or other disabilities. In such a case the employment of a near relation of that employee may be considered only for providing assistance immediately needed by the family of that employee.

3. **Persons belonging to the families of land losers :** Candidates hailing from families who might have been uprooted from their places of residence due to acquisition of homestead land by the Government or whose main source of income is substantially affected due to loss of agricultural land as a result of the land in question being acquired by the Government for public purpose shall also be covered in this category.

Only one member from an uprooted/affected family shall be eligible for consideration against vacancies reserved for the exempted categories. This beneficiary should be either an awardee of compensation for acquisition of land or a member of the family of the awardee.

This shall be applicable only in respect of cases where the land in question has been acquired by the State Government on or after 17th October 1977.

653

3. **Persons belonging to the families of Land Loser :** (1) For the purpose of enlistment of eligible persons of this category the Government may constitute a screening committee for a District/Sub-Division. The Screening Committee will prepare a combined list in order of priority for families affected by acquisition of land and forward the same to the District Magistrate concerned. Till such Committee is formed the District Magistrate concerned will prepare the list of eligible persons of this category.

(2) Only one member of a family of land loser will be eligible for consideration for enlistment in the exempted category. The beneficiary should be either an awardee of compensation for acquisition of land or a member of his family as may be nominated by the awardee.

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও কাজের অধিকার নেটওয়ার্ক, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি, বাংলার মুখ, আমরা, বন্দী মুক্তি কমিটি, এস ডি পি আই, আর এস পি, সি পি আই এম এল (লিবারেশন), ফ্যাসিবাদ বিরোধী মঞ্চ শিলিগুড়ি, ফ্রেন্ডস অব ডেমোক্রেসি, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম ও বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম)

কিরীটি রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এস. এস. প্রিন্ট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

১লা ফেব্রুয়ারী, ২০২২

সাহায্য মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র